দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১০ম সংখ্যা ❖ ২ অক্টোবর ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- লাদাখে জনবিদ্রোহেও বিজেপি রাহুল গান্ধীর উস্কানি দেখছে ২
- ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতিতে কি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র সম্ভব হবে ৪
- পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার কারণে ভারত ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ৬
- বানু মুশতাকের দশেরা বক্তৃতা ৭
- আদানীদের সম্পর্কে কোনও খবর করা যাবেনা ; ভারত সরকারের নির্দেশ ৮
- ভাষাগত মৌলবাদ, বাংলা ভাষা ও আমরা ৯
- মহাত্মা গান্ধি ১১
- শ্রদ্ধাঞ্জলি : মহান পথ প্রদর্শক পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২
- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান ১৪
- ১৯৭২ এ গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে কারা ? কেনো? ১৬
- স্মরণ : ফরিদা পারভিন ১৬
- প্রতিবাদের মুখ, মানবতার মুখ, জুবিন গর্গ ১৮

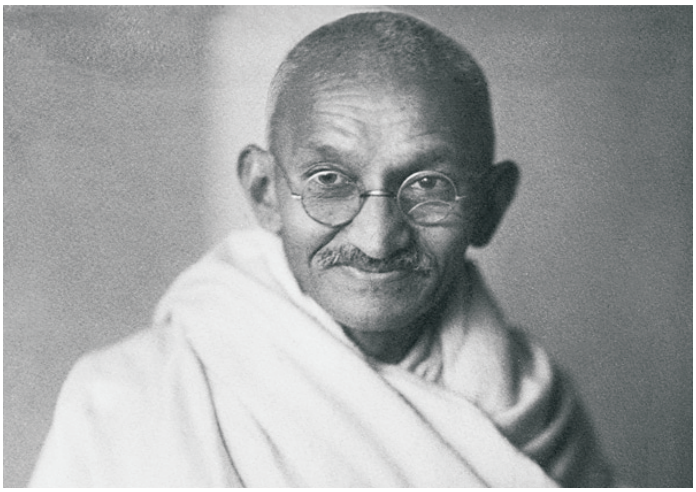

➲সম্পাদকীয়

বিজেপি দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ ধ্বংস করতে চায়

বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর ঘোষণা করেছিল তারা ‘কংগ্রেসমুক্ত ‘ভারত গড়ে তুলবে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচার, ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার একতরফা সমর্থন ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে হিন্দি বলয়ে তারা সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় ।তাদের ক্ষমতায় আসার রসায়ন ছিল এই রকম। এবার তাদের লক্ষ্য ‘ বিরোধীশূন্য‘ ভারত গড়া। দেশের সংবিধানে প্রদত্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস করা। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা ।আসল উদ্দেশ্য দেশের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় বহুত্ববাদকে ধ্বংস করা ।লাদাখের ঘটনা তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

সকলেই জানেন লাদাখের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদ সোনাম ওয়াংচুককে গত ২৬ সেপ্টেম্বর লাদাখ পুলিশ ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার করেছে, যাতে জামিন পাওয়া অসম্ভব। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি হিংসায় উস্কানি দিয়েছেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর লে ‘ তে পুলিশের গুলি চালনায় ৪ জন যুবক নিহত হয় ।অসংখ্য মানুষ আহত হন। ক্রুদ্ধ যুবকরা বিজেপি অফিস-এ অগ্নি সংযোগ করে ।লাদাখ বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বিজেপির পদত্যাগী রাজ্য সভাপতি চেরিং দরজে বলেছেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিজেপি সরকার লে’র জন্য ষষ্ঠ তপশিল ও পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুর্ণ করেনি ।লাদাখের জনসাধারণ ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি দলকে সমর্থন করেছেন । সোনম ওয়াংচুকও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না ।এখন তিনি লাদাখবাসীর যুক্তিসঙ্গত দাবির সমর্থনে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দুইবার দীর্ঘদিন অনশন করেছেন ।

স্বভাব অনুযায়ী বিজেপির আই. টি সেল একটি ত্রুথদ্ধত্র ‘ ভিডিও প্রচার করে বলছে ‘কংগ্রেস হিংসায় মদত দিয়েছে ।লাদাখ পুলিশ সূত্র অনুযায়ী কংগ্রেস কাউন্সিলার-এর হিংসায় মদত দেবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি । এইবার লাদাখের ডি.জি.পুলিশ , এস ডি সিং জামওয়াল নিয়মনীতি ভেঙে রাজনৈতিক বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন সোনাম ওয়াংচুক আলোচনায় অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে । এটা বিজেপির পুরনো স্বভাব ।

তাঁরা কৃষক আন্দোলনকারীদের বলে খালিস্তানি , ছাত্রদের বলে আরবান নক্সাল , আদিবাসীদের বলে মাওবাদি, বাংলাভাষীদের বলে বাংলাদেশী , তামিলরা এলটিটিই , আর বিরোধীরা ও লাদাখিরা সব পাকিস্তানপন্থী ।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

লাদাখে জনবিদ্রোহেও বিজেপি রাহুল গান্ধীর উষ্কানি দেখছে

মিলন দত্ত

তাঁর আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে সমাজ ও পরিবেশ কর্মী সোনম ওয়াংচুককে শেষপর্যন্ত গ্রেফতারই করল নরেন্দ্র মোদির সরকার। ২৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বেলা আড়াইটে নাগাদ লাদাখের ডিজিপি এসডি

সিং জামওয়ালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওয়াংচুককে তাঁর লে-র বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে তাদের হেফাজতে নিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেফতার করে ৬৯ বছর বয়স্ক সোনমকে বিমানে যোধপুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। গত কয়েক দিন ধরেই সোনম ওয়াংচুক বলছেন, তাঁকে কোনও কোনও ছুতোয় গ্রেফতার করা হতে পারে। তার জন্য তিনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি এটাও বলেছিলেন যে, তাঁকে গ্রেফতার করে সমস্যার সমাধন হবে না, তাতে অসন্তোষ আর গণ্ডগোল বরং বাড়বে।

সোনমের সংস্থা 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখ' (এইচআইএএল) এবং 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল)-এর বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে বিদেশি অনুদান নেওয়ার অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আমিত শাহর দফতর। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন তথা এফসিআরএ লঙ্ঘনের অভিযোগে পদক্ষেপ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

সোনমের সংস্থা 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ'-এর এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল করা হয়। বৃহস্পতিবারই সোনম জানান, প্রায় দিন দশেক আগে সিবিআই-এর তদন্তকারী দল সরকারি নির্দেশনামা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্গত করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩৫ দিনের জন্য অনশনে বসেছিলেন ওয়াংচুক-সহ 'লেহ অ্যাপেক্স বডি'-র কয়েক জন সদস্য। আর তারপরেই সিবিআই-এর নিশানা হন তিনি। সোনম ওয়াংচুকের গ্রেপ্তারের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বলেন, 'ওয়াংচুকের গ্রেপ্তার দুঃখজনক, তবে আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি কেন রাখছে না, তাও বোধগম্য নয়।' লাদাখের সাংসদ হাজি হানিফা বলেছেন, 'যদি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জন্য ওয়াংচুককে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, তবে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।' কংগ্রেস নেতা জি এ মীর বলেছেন, 'একজন সম্মানীয় ও গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীকে গ্রেপ্তার করা অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায়।' আগামী ৬ অক্টোবর লাদাখের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে

বসার কথা রয়েছে কেন্দ্রের। লাদাখবাসী রাজ্যের মর্যাদা, ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং তার উপজাতি পরিচয় এবং ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য বৃহত্তর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লে শহরে অনশন শুরু হয়। গত ২৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার অনশনরত ১৫ জনের মধ্যে দুজনের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাদের হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হয়েছিল। এরপর, বিক্ষোভকারী সংগঠনগুলি; লাদাখ অ্যাপেক্স বডি (LAB)-র যুব শাখা বুধবার লে বন্ধের ডাক দেয়। সেই সময় বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ

সহিংস রূপ নেয়। বিশাল বিক্ষোভ ও বন্ধের মধ্যে একদল যুবক পাথর ছুঁড়লে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হয়। আরও

অস্থিরতা রোধে সংবেদনশীল এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বাতিল এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করার পর লাদাখকে একটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভাগ করা হয়। তবে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিপরীতে লাদাখ কোন আইনসভা পর্যন্ত পায়নি। তার ফলে লাদাখ অঞ্চলটি সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে চলে যায়। তারপর থেকে লাদাখবাসী রাজ্যের মর্যাদা, ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং তার উপজাতি পরিচয় এবং ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য বৃহত্তর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

লাদাখের জাতিগত ও ধর্মীয় জনবিন্যাসের চেহারাটা এই রকম ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত লাদাখের আনুমানিক জনসংখ্যা প্রায় ২,৯৯,০০০, যদিও অভিবাসন এবং পর্যটনের কারণে পরিসংখ্যান ওঠানামা করতে পারে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, জনসংখ্যা ২,৭৪,২৮৯ জন, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৌদ্ধ, তবে ধর্মীয় গঠন ভিন্ন ভিন্ন, কার্গিল জেলা মুসলিমপ্রধান এবং লেহ বৌদ্ধপ্রধান।

অনুমান করা হয়, লাদাখের জনসংখ্যার ৯০%এরও বেশি উপজাতি। লাদাখের প্রাথমিক তফসিলি উপজাতি হল বালতি বেদা, বট (বা বোটো), ব্রোকপা (বা দ্রোকপা, দর্দ, শিন), চাংপা, গারা, মোন এবং পুরিগপা। ২০২০ সালের একটি তথ্য অনুসারে, লাদাখে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৪৬%, আর বৌদ্ধ জনসংখ্যা কিছুটা বেশি, প্রায় ৪৬.৪%।

লাদাখের বিক্ষোভ সম্পর্কে পাঁচটি তথ্য এখানে দেওয়া হল। অনশনের সূত্রপাত কীভাবে শুরু হয়, কারা বন্ধের ডাক দেয় এবং কারা এতে জড়িত ছিল।

১. লাদাখে কেন মানুষ বিক্ষোভ করছিল

লাদাখের সমাজ শিক্ষা ও জলবায়ু নিয়ে সক্রিয় সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে একদল মানুষ গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে অনশন করেন। তাঁরা লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি

রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ওয়াংচুক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, 'এই তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভই তাদের রাস্তায় নামিয়ে এনেছে। গত পাঁচ বছর ধরে তারা বেকার, বারবার কোনও না কোনও অজুহাতে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এবং লাদাখের কোন দাবিই পূরণ হয়নি। আমি বলব এটি সামাজিক অস্থিরতার একটি উপাদান। কিছু মানুষ মনে করে যে ওরাই কেবল আমাদের সমর্থক, কিন্তু বাস্তবে পুরো লাদাখ আমাদের সঙ্গে এবং এই দাবিদাওয়ার পাশে রয়েছে। এটা তরুণদের বিক্ষোভও বটে।' ওয়াংচুক আরও বলেন, 'আমি তরুণ প্রজন্মের কাছে আবেদন করছি যেন তাঁরা সহিংসতার আশ্রয় না নেন; এটা করলে আমাদের পাঁচ বছরের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবে। এটা আমাদের পথ নয়। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের কাছে আমাদের দাবিগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এবং আমি চাই তারা আমাদের শান্তির বার্তা শুনুক।' কেন্দ্র এবং লাদাখের প্রতিনিধিদের মধ্যে পরবর্তী দফা আলোচনার তারিখ ৬ অক্টোবর নির্ধারিত ছিল। সেই আলোচনায় লে অ্যাপেক্স বডি (জ্রঙ্ক) এবং কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (ক্তক্সঙ)-এর সদস্যরাও থাকবেন। ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে যদি আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের উপজাতি অঞ্চলগুলির অন্তর্ভক্ত হতে পারে তাহলে লাদাখ নয় কেন? এটাই তাঁদের প্রশ্ন। ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের এই বিশেষ বিধানটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়। সেই ক্ষমতা বলে তাঁরা তাঁদের জমি, অরণ্য এবং স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারেন। এর লক্ষ্য উপজাতিদের অধিকার, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং স্বশাসন রক্ষা করা। উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, লাদাখে তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা প্রায় ৯৭, তার মধ্যে লে-তে ৬৬.৮, নুব্রায় ৭৩.৩৫, খালস্তিতে ৯৭.০৫, কার্গিলে

৮৩.৪৯, সাঙ্কুতে ৮৯.৯৬ এবং জান্সকারে ৯৯.১৬। উত্তরপূর্বাঞ্চলের অনেক জায়গায় এর চেয়ে অনেক কম উপজাতি বা আদিবাসী নিয়েও তারা সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লাদাখবাসীর আরও একটা দাবি হল, লাদাখ এবং কার্গিলের জন্য দুটো লোকসভা আসন করতে হবে। এখন লাদাখে একটাই লোকসভা আসন।

২. বিক্ষোভে কে নেতৃত্ব দিলেন

লাদাখের লে-তে রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিল লেহ অ্যাপেক্স বডি (জ্রঙ্ক), যা বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একটি সমন্বয়। দীর্ঘদিন ধরে লাদাখের অধিকার এবং উন্নয়নের পক্ষে কাজ করা কর্মী সোনম ওয়াংচুক এই গোষ্ঠীর একজন সদস্য। ওয়াংচুক বিক্ষোভের সামনে ছিলেন এবং লাদাখবাসীদের দাবিগুলো নিয়ে একটা 'ফলপ্রসু' আলোচনার জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অনশন ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভের সময় একজন বয়স্ক মহিলা এবং একজন পুরুষ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর 'ল্যাব' (জ্রঙ্ক) যুব শাখা বুধবার লে-তে বন্ধের ডাক দেয়। ওই দিনই ল্যাব লে

শহরে বিজেপি অফিসের বাইরে একটি গণসমাবেশের আয়োজন করে। সেখান থেকেই কেউ বিজেপি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই আন্দোলনে কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (ক্তক্সঙ)-ও অংশগ্রহণ করেছিল, তারা ল্যাবের দাবিগুলিকে সমর্থন করে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর বনধ সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে সংহতি কর্মসূচির ডাক দেয়। দুটি সংগঠন গত চার বছর ধরে যৌথভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের দাবিগুলি এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে বহিবার আলোচনা করেছে।

৩. কেন বিজেপি লে বিক্ষোভের জন্য কংগ্রেসকে দোষারোপ করছে

বিজেপি নেতা অমিত মালব্য লেহের সহিংসতার ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেছেন এবং কংগ্রেসকে এর সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি মোদির নিয়ম মেনেই যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন রাহুল গান্ধীর ওপর। মালব্য তাঁর এক্স প্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রশ্ন করেছেন, 'রাহুল গান্ধী কি এই ধরণের অস্থিরতার পরিকল্পনা করছেন?' বিজেপি এখন যেকোনও গণআন্দোলনে রাহুল গান্ধীর ভুত দেখছেন। মালব্যর বক্তব্য, 'লাদাখে যিনি দাঙ্গা বাধিয়েছেন তিনি হলেন আপার লে ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর ফুন্টসোগ স্টানজিন সেপাগ। তাঁকে দেখা গেছে জনতাকে উস্কে এবং বিজেপি অফিস এবং পার্বত্য কাউন্সিল লক্ষ্য করে হিংসাত্মক বিক্ষোভে অংশ নিতে।'

কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত একজন সোশালমিডিয়া পোস্টে বলেছেন, 'লাদাখের লে শহরে সোনম ওয়াংচুকের অনশনের কয়েকদিন পর, এবার তরুণদের পালা; তারা পূর্ণ শক্তিতে বেরিয়ে এসে বিজেপিকে বাস্তবতা যাচাই করে দেখিয়েছে।' কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভায় বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী, গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী কারচুপির মোকাবিলা করতে যুবসমাজ এবং ভারতের তরুণদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিজেপি নেতারা রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে অভিযোগ করেন যে তিনি তরুণদের উস্কে দেওয়ার এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন।

৪. লাদাখে জেনারেল জেড-এর বিক্ষোভের দাবি

অনেক মানুষ দাবি করেছেন যে লাদাখে বিক্ষোভকারীরা ছিলেন জেন-জি বা তরুণ প্রজন্ম। এক্স-এ একজন ব্যক্তি লে থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেছেন'জেন জি-রা লাদাখের রাস্তায় বেরিয়েছেন।' আরেকজন নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করেন 'লাদাখে জেন-জির বিক্ষোভকারীরা

বিজেপি অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা।' দ্য প্রোটাগনিস্ট নামে একটি অ্যাকাউন্ট লিখেছে 'এটা নেপাল নয়। এটা লাদাখ।' সোনম ওয়াংচুক ইতিমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন 'লে শহরে যেচা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। শান্তিপূর্ণ পথের আমার বার্তা ব্যর্থ হয়েছে। আমি তরুণদের কাছে এই বাজে কথা বন্ধ করার আবেদন করছি। এটা কেবল আমাদের উদ্দেশ্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।'

৫. লাদাখে কী ঘটেছিল

লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় রাজ্যের মর্যাদা দাবিতে বুধবার লেহে আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। মঙ্গলবার ওয়াংচুক তাঁর ১৫ দিনের অনশন শেষ করে সমর্থকদের দিংসা ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরতে বলেন। কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক ৬ অক্টোবর নির্ধারণ করা হলেও অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে বিক্ষোভকারীরা অনশনের তারিখ এগিয়ে আনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বুধবার, এনডিএস মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে বিশাল জনতা জড়ো হয় এবং রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে শহর জুড়ে মিছিল করে। শত শত বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে আসে, দূর থেকে আগুনের শিখা এবং কালো ধোঁয়া দেখা যায়। কিছু ব্যক্তি বিজেপি অফিস এবং পার্বত্য কাউন্সিলে পাথর ছুঁড়তে শুরু করলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। লাদাখের রাজধানীতে সম্পূর্ণ বন্ধের মধ্যে বিজেপি অফিসের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারা বিজেপি অফিস কমপ্লেক্সের আসবাবপত্র এবং কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয় এবং কয়েক ঘন্টা ধরে সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়, যদিও শহরটি এখনও উত্তেজনাপূর্ণ।

ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতিতে কি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র সম্ভব হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্যালেস্টাইনকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিটেন, কানাডা আর অস্ট্রেলিয়া। প্যালেস্টাইনকে দেওয়া এই স্বীকৃতি 'জিহাদি হামাসের জন্য উপহার ছাড়া আর কিছু নয়' বলে মন্তব্য করেছে ইসরায়েল। কাগজে কলমে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র বলে কিছু নেই। তবে রাষ্ট্র হিসেবে বহু দেশ এই ভূখণ্ডকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে, বিভিন্ন দেশে এই দেশের কূটনৈতিক মিশনও রয়েছে। অলিম্পিক সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণও করে তারা। কিন্তু ইসরায়েলের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের দীর্ঘসময়ের বিরোধের কারণে প্যালেস্টাইনের কোনো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানা, রাজধানী বা সেনাবাহিনী নেই।

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর বহু বছরের দখলদারিত্ব চলার পর ১৯৯০-এর দশকে 'প্যালেস্টিনিয়ান অথরিটি! বা প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাদের ওই ভূখণ্ড ও সেখানে বসবাসরত মানুষের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। ইসরায়েলের আগ্রাসনে গাজা গত এক বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধক্ষেত্র। কাজেই এই পরিস্থিতিতে প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেয়া অনেকটাই প্রতীকী। নৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা হল; যুক্তরাজ্য, কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ার ওই সিদ্ধান্তে প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তন হবে না। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রায় ৭৫ ভাগই প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘে প্যালেস্টাইনের সদস্যপদ 'স্থায়ী পর্যবেক্ষক' হিসেবে। এর অর্থ তারা জাতিসংঘের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে, কিন্তু কোনো বিষয়ে ভোট দিতে পারবে না।ব্রিটিশ আর ফরাসীদের স্বীকৃতির পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের চারটির সমর্থনই পাবে প্যালেস্টাইন। অবশ্য চীন আর রাশিয়া ১৯৮৮ সালেই প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এর ফলে প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েল; দুই রাষ্ট্রের সমাধান সূত্রটা আবার সামনে এসে পড়লো। প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েল দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের সমাধান প্রথম এসেছিলো ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের মাধ্যমে। সে সময় বলা হয়, ইসরায়েল হবে ইহুদিদের জন্য এবং প্যালেস্টাইন আরবদের জন্য। তবে ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। যেটা আরবরা মানেনি। এর ধারাবাহিকতাতেই প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধহয়েছিল। কিন্তু একটা সময়ে এসে ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন উভয়পক্ষই দুই রাষ্ট্র সমাধানে ঐকমত্য হয়। কিন্তু সেটা কিভাবে হলো? এবং পরে কেন আবার ব্যর্থ হল সেটাই বড় প্রশ্ন।

'দুই রাষ্ট্র' সমাধান কী

প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েল পৃথক দুটি রাষ্ট্রের ধারণা প্রথমবারের মতো বাস্তবতার দিকে এগোতে শুরু করে ১৯৯৩ সালে নরওয়ের অসলোতে প্যালেস্টাইন-ইসরায়েলের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে। যেটা অসলো অ্যাকর্ড নামে পরিচিতি। ওই চুক্তিতে পশ্চিম তীর এবং গাজায় সরকার পরিচালনার জন্য একটি প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়। সেটা গঠনের সময়সীমা ছিলো পাঁচ বছর। সেই চুক্তির পরে প্যালেস্টাইনিরা স্বীকার করে নেয় ইসরায়েল রাষ্ট্রকে। চুক্তি অনুযায়ী অবশ্য খুব দ্রুতই পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা নিয়ে সম্ভাব্য প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের একটি কর্তৃপক্ষও গঠন করা হয়। কিন্তু তারপরই শান্তি প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। নানারকম বাধা তৈরি হয়।

শান্তি প্রক্রিয়া কেন স্তব্ধ হল

অসলোতে দুই রাষ্ট্র সমাধান মেনে নেয়া হলেও সেই রাষ্ট্র কবে গঠন হবে তার কোন সময়সীমা বেধে দেয়া হয়নি। এমনকি ইসরায়েলের বাইরে আলাদা একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়েরও কোন সমাধান করা হয়নি। এই চারটি বিষয় হচ্ছে,

প্রথমত, দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত কোথায়, কিভাবে নির্ধারণ হবে সেটা।

দ্বিতীয়ত, জেরুসালেম কার অধীনে থাকবে।

তৃতীয়ত, প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডের ভেতরে থাকা ইসরায়েলি বসতিস্থাপনকারীদের কিভাবে সরিয়ে নেয়া হবে।

চতুর্থত, ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পর থেকে ইসরায়েলের ভেতরে থাকা যেসব প্যালেস্টাইনি বাস্তচ্যুত হয়েছেন, তারা ইসরায়েলে কিভাবে ফিরবেন।

চুক্তিতে বলা হয়েছিলো, পাঁচ বছরের মধ্যে একটি প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষ গঠনের পর এগুলো আলোচনার ভিত্তিতে পরে ঠিক করা হবে। কিন্তু সেটা আর কখনোই হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়ন না হবার পেছনে দু'পক্ষেরই দায় ছিল। ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন; দুই পক্ষেই চুক্তি বিরোধী শক্তিশালী দুটি গ্রুপ ছিল, যারা এই ঐক্যমত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, দুই পক্ষই দাবি করছিল পুরো ভূখণ্ডই তাদের এবং শুধু তাদেরই রাষ্ট্র হবে। রাষ্ট্র আদায়ের দাবিকে প্যালেস্টাইনিরা জিহাদ হিসেবে নিয়েছিল হামাস এবং ইসলামী সংগঠনগুলো। আর ইসরায়েলে ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী গ্রুপগুলো পুরোটাই ইসরায়ের দখলে রাখার দাবি করেছিল।। ফলে অসলো অ্যাকর্ড আর এগোয়নি।

কিন্তু ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির পরপরই এর বিরোধিতায় হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ ইহুদিদের উপর হামলা শুরু করে। ওদিকে ইসরায়েলে একজন ইহুদি কট্টরপন্থীর হাতে খুন হন শান্তি চুক্তি সম্পাদন)করা সে দেশের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন। এরপর ১৯৯৬ সালে ইসরায়েলে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর ইসরায়েলের সরকারও আর শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি। পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন সময় দুই পক্ষের বৈঠক হলেও সমাধান আসেনি। এ সময় ইসরায়েল মূলত নজর দিয়েছে প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের উপর এবং জেরুসালেমকে তারা ইসরায়েলের রাজধানীও ঘোষণা করে। সবমিলিয়ে প্যালেস্টাইনে এখন যে ভৌগলিক বাস্তবতা তৈরি হয়ে ছে, তাতে করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই সন্দেহ রয়েছে।

স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র কি আর সম্ভব

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবার আগে দরকার ভূখণ্ড। কিন্তু পশ্চিম তীর, যেটা প্যালেস্টাউনের অংশ হবে সেখানে এখন কয়েক লাখ ইহুদি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এছাড়া জেরুসালেমকেও ইসরায়েল তার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে আগেই এবং আমেরিকা সেটাকে স্বীকৃতিও দিয়েছে। ফলে ভৌগলিকভাবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন এখন আর বাস্তব সম্মত নয় বলেই অনেকে মনে করেন।

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করা ১৯৯০ এর দশকের তুলনায় এখন খুবই কঠিন। কারণ, পশ্চিম তীর এবং জেরুসালেমে ব্যপক ইহুদি বসতি। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির সময় যা ছিল এক লাখ ২০ হাজার, গত তিন দশকে ইহুদি বসতি বেড়ে হয়েছে সাত লাখ। এছাড়া খোদ ইসরায়েলের আইন অনুযায়ীই অবৈধ এরকম ইহুদি বসতিও আছে। এই রকম বসতি সম্প্রসারণ এবং ইসরায়েলের রাজনীতিতে এর প্রবল সমর্থনের কারণে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন কঠিন হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া দুই রাষ্ট্র সমাধানের নিয়েও এখন আর ইসরায়েলের বিশেষ আগ্রহ নেই। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনিরাও হামাস এবং ফাতাহ দুই দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে প্যালেস্টাইনি জনগণের জন্য কথা বলা বা শান্তি প্রক্রিয়া এগনোর মতো একক এবং বিশ্বস্ত নেতা নেই বললেই চলে।

তাহলে কি দুই রাষ্ট্র সমাধান আর সম্ভব নয় ?

অনেকে মনে করেন, সুযোগ এখনো আছে। কিন্তু ইসরায়েল এখন আর দুই রাষ্ট্র সমাধান চায় কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। সব দেখেশুনে মনে হয়, ইসরায়েল সেটা চায় না। কিন্তু ইসরায়েলের কাছেও একটা সমাধান সূত্র আছে। সেই সমাধানটা হল, পরিস্থিতি যেরকম আছে, সেরকমই থাক। অর্থাৎ ইসরায়েল পশ্চিম তীর নিয়ন্ত্রণ করবে, যেখানে আবার একটা প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষও থাকবে; তবে সেটা হবে দুর্বল এবং ইসরায়েলের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু চিরদিন ইসরায়েল এভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে, এই ধারণাটাও ঠিক নয়। এই থেকে বেরিয়ে এসে একটা সমাধান সম্ভব। পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু ইসরায়েল এর আগে গাজা থেকে তাদের সব বসতি সরিয়ে নিয়েছিল এবং তারা গাজার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়েছে। কঠিন হলেও পশ্চিম তীরে সেটা করা সম্ভব। এমনকি জেরুসালেম নিয়েও দু'পক্ষ একটু ছাড় দিলে ঐকমত্যে আসা সম্ভব। কিন্তু ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে এখন যে নতুন যুদ্ধ পরিস্থিতি, সেখানে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা অচলাবস্থার পরিবর্তন কে করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

একমাত্র আমেরিকা আবার এগিয়ে গেলে এই সমাধান সম্ভব। বিশ্বের অন্যান্যদেশেরসমর্থন নিয়েমার্কিনযুক্তরাষ্ট্রশান্তির উদ্যোগ নিলেসেটা সফলহতেপারে।কিন্তুগত ২৩ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁর ভাষণে ট্রাম্প গাজায় হত্যালীলা চালানো সত্ত্বেও ইসরায়েলকেই সমর্থন করেন।গাজায় দুর্ভিক্ষ , গণহত্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে ট্রাম্প কোনও কথা বলেন নি।

ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্যে কিছু করতে চেয়েছে, তখন সেটা সম্ভব হয়েছে। মিশর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি, জর্ডানের সঙ্গে চুক্তি এমনকি সাম্প্রতিক কালে আব্রাহাম অ্যাকর্ড-এর সবগুলোর পেছনে আমেরিকার ভূমিকা আছে। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমেরিকার আগ্রহ আছে কিনা, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। দুই যুগ আগে নাইন-ইলেভেনের পর আমেরিকার চোখ অসলো শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন থেকে সরে যায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে।

আমেরিকা শান্তির উদোগ নিলে হয়তো সেটা আশা দেখাতে পারে। কিন্তু এখন ইসরায়েল-গাজা সংকট যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, সেখানে আমেরিকা-ইসরায়েল কিংবা হামাস; শান্তির কথা কেউই বলছে না। বলবে বলেও মনে হয় না। (ঋণ বিবিসি বাংলা)

পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার কারণে ভারত ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে

সৌর বসু

ট্রাম্প সাহেব জাতিপুঞ্জের সভায় ভারত এবং রাশিয়ার সমালোচনা করেছেন। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে ন্যাটো ভুক্ত দেশগুলি যে রাশিয়ার তেল কিনছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কখন কি বলেন তার কোনও ঠিক নেই। কিন্তু তাঁর এই এই উন্মত্ত আচরণের মধ্যেও একটা বার্তা থেকে যায়। তিনি বারবার বলছেন তিনি নাকি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করেছেন। ক্ষমতায় আসার আগে তিনি বলেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আসনে বসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন।। কিন্তু কোথায় কি। তিনি আবারও দাবী করেছেন যে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে মে মাসে চার দিনের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার হস্তক্ষেপের ফলেই সে যুদ্ধের নিষ্পত্তি ঘটে। ভারত এ কথা মানতে রাজি নয়। ভারত বিশ্বাস করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার ব্যাপারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোন ভূমিকা ছিল না। এ কথা জানতে পেরে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ঘনিষ্ঠ মিত্র মোদিজীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক তার এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। সাংহাই সহযোগিতা বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রপতি সি জিন পিং এর সঙ্গে মোদিজীর আলাপ চারীতার ছবি দেখে ট্রাম্প সাহেবের ক্ষোভ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি মন্তব্য করেন চীন ভারতকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । ভারত এই চুক্তিকে তার নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি বলে মনে করছে। চুক্তির বয়ানে আছে দুটি দেশের মধ্যে যে কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন উভয় দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে বিবেচিত হবে।

ভারতের কূটনীতিকরা চুক্তির এই প্রতিশ্রুতিকে ভারতের পক্ষে একটি ধাক্কা বলে মনে করছে করছেন। ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব কানওয়াল সিবাল বলেছেন এই এই চুক্তির ফলে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার উপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত তলমিজ আহমেদ মনে করেন যে ইসরাইল পশ্চিম এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। একদিকে তারা গাজা কে ধ্বংস করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে , প্যালেস্টাইনকে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইসরাইলের এই আগ্রাসনের ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। তারা ইসরাইলকে অস্ত্র পাঠিয়ে সামরিকভাবে শক্তিশালী করে তুলছে। গাজা ভূখণ্ডকে একটি প্রমোদ নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ইসরাইলের প্রকল্পের প্রতিও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সম্প্রতি ইসরাইল কাতারে বোমা বর্ষণ করেছে। কাতারের রাজধানী দোহাতে তখন হামাসের সঙ্গে কাতারের কূটনীতিবিদদের পশ্চিম এশিয়ায় শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। ইসরাইলের বক্তব্য তারা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামাসের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন তিনি এই আক্রমণের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। কাতার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তা সত্ত্বেও ইসরাইলি হানার থেকে কাতার রক্ষা পায়নি।

এই ঘটনার ফলে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি নিরাপত্তার অভাবে ভুগতে শুরু করেছে। তারই প্রতিফলন হিসাবে রচিত হয়েছে সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি। সৌদি আরবের প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তালমিজ আহমেদ মনে করেন সৌদি আরব পশ্চিম এশিয়ার প্রথম রাষ্ট্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি রচনার মধ্যে দিয়ে সামরিক ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তার অভাব বোধের প্রকাশ ঘটালো। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তালমিজ আহমেদ, করন থাপারের সঙ্গে কথোপকথনে জানিয়েছেন যে সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহুদিনের। ভারতের ৩০ লক্ষের বেশি দক্ষ শ্রমিক সৌদি আরবে কর্মরত। ভারতের সঙ্গে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা চলছে। তিনি মনে করেন এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যদি কোনও দিন যুদ্ধ হয় সৌদি আরব পাকিস্তানের পক্ষ নেবে। এ ধরনের অনুমান আগে থেকে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এরকম কোনও প্রতিশ্রুতি সৌদি আরবের পক্ষে থেকে দেওয়া হয়নি। করন থাপার চুক্তির বয়ান পড়ে শোনালে, উনি বলেন ওটা একটা সাধারণ বিবৃতি মাত্র।

বস্তুতপক্ষে ভারত পাকিস্তান সাম্প্রতিক যুদ্ধের পর পাকিস্তান কিন্তু আমেরিকার সাহায্যে সৌদি আরব সহ বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সংযোগ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চীন রাশিয়া তুরস্ক রয়েছে। এছাড়াও সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেও পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক অন্য একটা মাত্রা পেল। পাকিস্তান যে একটি বিচ্ছিন্ন দেশ নয় এই সত্য তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি আজও দোদুল্যমান।

অপারেশন সিন্দুরের পর পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেনি কোনও দেশ। উপরন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, ইরান এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলি। সর্বোপরি রাশিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছে এবং পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। কুয়েত পাকিস্তানের উপর ভিসা সংক্রান্ত যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নিয়েছে। কলম্বিয়ায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন শশী থারুর। তিনি সেখানে প্রত্যক্ষ করেন যে মে মাসের ৭ তারিখে ভারতের প্রত্যাঘাতে যে সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে কলাম্বিয়া সরকার।। ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থ্যতার ফলে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে ভারত ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

চীনের Tianjing বৈঠকের পর চীনের সঙ্গে ভারতের সংলাপের পথ প্রশস্ত হয়। চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলার সুযোগ একটা এসেছে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য ভুক্ত দেশগুলির আধিপত্যবাদের বিকল্প হিসেবে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। জিডিপির ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে ব্রিকসের সদস্য ভুক্ত দেশগুলির

অংশীদারিত্ব ৩৫ শতাংশ । তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্রিকসের সদস্য ভুক্ত দেশগুলির অংশীদারিত্ব ৩০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আসতে চলেছে। ভারতের সেদিকে নজর রেখে পররাষ্ট্রনীতি রচনা করা প্রয়োজন।

বানু মুশতাকের দশেরা বক্তৃতা

মনিরুল হক

"The Sky Dosenót Differntiate Between People And The Land Dosenót Expel Anyone" - BANU MUSHTAQ

কর্ণাটকের চামুন্ডেশ্বরী পাহাড়ে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী চামুন্ডেশ্বরী মন্দিরে চার'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমকালো ভাবে পালিত হয় দশেরা উৎসব। আগে এই উৎসব পরিচালিত হতো রাজ পরিবারের তত্বাবধানে। আর্থিক অসঙ্গতি ও অন্যান্য কারণে বছর পঞ্চাশ আগে দশেরা উৎসব পালনের দায়িত্ব কর্ণাটক সরকার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এবছর সেই উৎসব উদ্বোধনের জন্য সিদ্ধারামাইয়া সরকার ডেকে নেন লেখিকা বানু মুশতাককে। তাঁকে ডাকার কারণ অবশ্যই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সদ্যই তিনি অর্জন করেছেন 'বুকার' পুরষ্কার।

গোলযোগ শুরু হল এর পরেই। জিগির তোলা হল একজন মুসলিমকে দিয়ে দশেরা উৎসব উদ্বোধন করানো যাবে না। সে জিগির জেহাদ হয়ে পৌঁছে গেল হাইকোর্টে এবং তারপর সুপ্রিম কোর্টে। সুখের বিষয়, হিন্দুত্ববাদীদের আপত্তিতে কান দেয় নি আদালত। গত ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিপুল সংখ্যক আমজনতার উপস্থিতিতে কর্ণটকের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও বিশিষ্ট অতিথিদের পাশে নিয়ে পুরোহিতদের মন্ত্র উচ্চারণের মাঝে মা চামুন্ডেশ্বরী মুর্তিতে পুষ্প অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দশেরা উৎসবের সূচনা করলেন প্রখ্যাত কন্নড় লেখিকা ও সমাজকর্মী বানু মুশতাক।

বানু মুশতাক গল্প লিখছেন বহুদিন ধরে। প্রকাশিত হয়েছে ৬টি গল্প সংকলন, একটি উপন্যাস এবং বহু সংখ্যক কবিতা। কন্নড় সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরষ্কারেও তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তবে তাঁর গল্পে-কবিতায় থাকে না কোন চমক, থাকে না রসঘন কোন বর্ণনা, থাকে না কোন নির্দেশবাক্য অথবা মধুর কোন সমাপ্তিরেখা। ছোট-বড় ঘটনা, যা আমরা রোজ রোজ ঘটতে দেখি, সে সবের কথাই নিপুন সুতোয় বুনে তিনি হাজির করেন আমাদের সামনে। পড়তে গিয়ে চমকে উঠি-'আরে, এ তো আমাদেরই কথা, আমরাই তো এসব ঘটনার কুশীলব'। তাঁর গল্পে যত কথা তিনি বলেন তার থেকে অনেক বেশি রয়ে যায় 'না বলা কথা'। আসলে তিনি চান, সেই না বলা কথাগুলি আমরাই বলি, আলোচনা করি, ছড়িয়ে দিই আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে। সামাজিক কাজকর্মেও তিনি অগ্রণী একজন মানুষ। সমতা, ন্যায্য অধিকার, আইনি অধিকার বিশেষত মহিলাদের অধিকার আন্দোলনে তাঁকে আমরা সবসময় দেখেছি প্রথম সারিতে। মুসলিম নারীদের মসজিদে নামাজ পড়ার অধিকার নিয়েও তাঁকে সরব হতে দেখা গেছে। গৌরী লঙ্কেশের 'লঙ্কেশ' পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত লেখক। কবিতা তথা সাহিত্যকে সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য গড়ে উঠেছিল 'বান্দায়া আন্দোলন' । বানু মুশতাক ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। বান্দায়া আন্দোলনের মূল শ্লোগান ছিল-"Let Poetry Be A Swordæ The Dear Friend Who Respond To The Pain Of People". আসলে বানু মুশতাক হচ্ছেন একজন সৃজনশীল সামাজিক মানুষ যাঁর শিকড় কর্ণাটকের মাটির গভীরে প্রোথিত।

দশেরা উৎসবের সূচনা করে যে কথাগুলি শ্রীমতী মুশতাক

বলেছেন সেগুলি অবশ্যই তাঁর নিজের কথা কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব, সে কথাগুলি আমাদেরও নিজের নিজের কথা, দেশের কথা, মাটির কথা, ভারতাত্মার কথা। আর এইখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন বানু মুশতাকের দশেরা বক্তৃতা। তাঁর মতে দেবী চামুন্ডেশ্বরী নারীশক্তির প্রতীক। কিন্তু সেই নারী শুধুমাত্র মাতৃস্নেহ ও কোমলতার প্রতীক নন, সেই নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তিও। তিনি বলেছেন- "Calling Chamundeswari Mother– Calling it Nadda Habba Severyoneós festivalV is a part of our Culture. So it is dear to me too." তিনি বলেন, সংস্কৃতিই আমাদের উৎস, সম্প্রীতি আমাদের শক্তি। ভালোবাসা ও মানবতার আধারে এক নতুন সমাজ গড়ার কথাও তিনি বলেন যেখানে সবার অংশীদারিত্ব থাকবে, সবাই সমান সুযোগ পাবে। এ সময়ে দশেরা উপলক্ষে সেজে উঠেছে গোটা কর্ণাটকের সাথে মহীশুর শহরও। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক আলোকমালা অপরদিকে ধর্মীয় সমারোহর সাথে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতির মেলবন্ধন এই উৎসবকে করে তুলেছে অনন্য। শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ; শুধু রাজপরিবার নয়, শুধু ব্রাহ্মণ নয়; ধনী-দরিদ্র, জাত-পাত নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মহা আনন্দে অংশগ্রহন করেন এই দশেরা উৎসবে। বানু মুশতাকের কথাগুলিও এই ঐক্য, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতর সঙ্গে যথার্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর বানু মুশতাক-ই প্রথম নয়, এর আগে কবি নিশার আহমেদ এই দশেরা উৎসবের সূচনা করেছেন। এক সময়কার দেওয়ান মির্জা ইসমাইলও উদ্বোধন করেছেন এই দশেরা উৎসবের। আর রাষ্ট্রক্ষমতা যখন রাজপরিবারের হাতছাড়া হয়, তখনও হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের হাতে সূচনা হয়েছে এই উৎসবের। তা সত্বেও এবার প্রবল বিরোধীতার মুখে পড়েছিল কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। নানা জন নানাভাবে বিরোধীতা করার চেষ্টা করেছেন, কিছুতেই একজন মুসলিম নারীকে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা তাঁরা করতে দেবেন না। একজন এম এল এ, Basangagouda Patil Yatnal বানু মুশতাক সম্পর্কে বলেছিলেন,-" Her ইনাগুড় Dasara by Offering Flowers and Lighting up Lamp of Goddess Chamundeswari Seems To Be In Conflict with Her Own Religious Beliefs– Which Emphasises Belief In Only One God And One Holy Book." মহীশুরের প্রভাবশালী সাংসদ Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar আবার বলেছেন, "If Banu Musthaq Says That She Respects Mother Chamundi– Our Problem is Solved."

এসবের কথার উত্তরে যে ছোট্ট বাক্যটি বানু মুশতাক উচ্চারণ করেছেন তা অতীব মূল্যবান। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, -é" My religious Beliefs and Life Lesson Do Not Step Out Of My Dooræ" আর বলেছেন, ‘‘আজকের দুনিয়া, যেখানে হিংসা, ধর্মীয় বিদ্বেষ আর ঘৃণায় বিভক্ত সেখানে এ উৎসব বয়ে আনুক একতার বার্তা।’’

আদানীদের সম্পর্কে কোনও খবর করা যাবেনা ; ভারত সরকারের নির্দেশ

অমিতাভ সিংহ

কয়েকদিন আগে একটা খবরে চোখ আটকে গেল। খবরটা এরকম, বিশিষ্ট সাংবাদিক পরন্জয় গুহঠাকুরতাসহ চারজন সাংবাদিক দিল্লী হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি নির্দেশের বিরুদ্ধে। নির্দেশটি হচ্ছে রোহিনী কোর্টের এক বিচারপতির একটি রায়,যাতে বলা হয়েছে আদানী গোষ্ঠীর কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন মানহানিকর নিবন্ধ বা ভিডিও ইত্যাদি প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না এবং ইতিমধ্যে যে ১৩৮ টি ভিডিও বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে রয়েছে তা তুলে নিতে হবে। এই রায় উক্ত সাংবাদিকদের, নিউজলন্ড্রীসহ ১২ টি ডিজিটাল প্লাটফর্ম ও স্বাধীন সাংবাদিকদের মেনে চলতে বলেছে উক্ত মন্ত্রক।ঘটনাটি ১৬ সেপ্টেম্বরের। উক্ত আদালতের আরেক বিচারপতি রাকেশ সিং এর বক্তব্য শুনে আরও অবাক হতে হয়।তিনি এই মামলা পেছিয়ে দিয়ে বললেন যে এটা কি জীবন মৃত্যুর ব্যাপার নাকি যে এখনই শুনতে হবে। এই মামলা কদিন পরেও শোনা যেতে পারে। তাদের বক্তব্য আদানীদের বিরুদ্ধে বলা মানে ভারতের স্বার্থের ও উন্নয়নের বিরুদ্ধে বলা। একটি নিম্ন আদালতের একতরফা নির্দেশের ভিত্তিতে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তোর সইলো না , তারাও একতরফা নির্দেশ জারি করে দিলো । যদিও ওই নির্দেশের ওপর উচ্চ আদালত ইতিমধ্যেই স্থগিতাদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সাংবাদিকদের বক্তব্য না শুনে একতরফা নির্দেশ জারি করা হয়েছিল ।

আসলে এটা পরন্জয় গুহঠাকুরতা, আবীর দাসগুপ্ত,রবি নায়ার ও অয়সকান্ত দাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা মনে হলেও জল কিন্তু অনেক গভীরে। এদের লক্ষ রবীশকুমার,অজিত অন্জুমের মত প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় মেরুদণ্ড সোজা রাখা সাংবাদিককুল ও দ্য ওয়ারের মত কতিপয় সংবাদমাধ্যম। কারণ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মেইনস্ট্রিম চ্যানেলের বেশীরভাগই আদানী বা অম্বানীদের হাতে চলে গিয়েছে। বাকি যেগুলি আছে তারা বিজ্ঞাপনের জন্য মোদী সরকারের ওপর

নির্ভরশীল। তাই তাদের পক্ষে আদানী ও মোদীর মধ্যে যে অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তা নিয়ে কিছু লেখা সম্ভব নয়।আসুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে মোদী সরকার আদানীদের পক্ষে অনবরত কাজ করে চলেছে।

বছর দুয়েক আগে আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ একগুচ্ছ প্রতারনার অভিযোগ তুলে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। বিশ্বের বহু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্পোরেট প্রতারণার তকমা দেয়। সেসময় আদানীদের দশটি সংস্থার শেয়ারের মূল্য প্রবলভাবে পড়ে যায়। জনগন হারায় কয়েক হাজার কোটি টাকা। আদানীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বেআইনিভাবে কাজকারবার ও স্টক ম্যানিপুলেশনের। তারা তাদের কয়েকটি কোম্পানি যেমন এডিকর্প এন্টারপ্রাইস প্রাইভেট লিঃ, মাইলস্টোন ট্রেডলিঙ্কস প্রাঃ লিঃ ও রেভার ইনফাস্ত্রাকচার প্রাঃ লিঃ কে ব্যবহার করে ঘুরপথে তাদেরই অন্য কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে তাদের শেয়ারের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করে তাদের প্রতারণা করেছিল।সেবির তৎকালীন চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বিচের সঙ্গে আদানীদের যোগসাজশ প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু বিরোধীদের প্রবল দাবী সত্ত্বেও মোদী সরকার মাধবী পুরীকে পদত্যাগ করতে বলে নি শুধু আদানীদের স্বার্থরক্ষার জন্য। সুপ্রীম কোর্ট সেবিকে তদন্ত করতে বলেছিল।কিন্তু অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সেবি আদানীদের ছাড় দেয় মূলত মোদী সরকারের চাপে।

দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর পরিচালনার ভার সরকার আদানীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কয়েকটি সমুদ্রবন্দরও তাদের ওপর ন্যস্ত। এছাড়া বহু পরিকাঠামোও আদানী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করছে মোদীর বদান্যতায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ার জন্য গরীব মানুষদের উৎখাত করে জমি পাইয়ে দেওয়ার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। যেমন অসমের ধুবরিতে পাঁচ হাজার পরিবার বা ২০ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তিন দিনের নোটিশে। বাড়ি,বাজার,স্কুল,পঞ্চায়েত অফিস,মন্দির,মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে জমি দেওয়া হয়েছে নামমাত্র বিশ ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে।নদীর ধারে উঁচু জমিতে তারা ৩৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়বে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে।

বিহারে ভাগলপুরে ১০২০ একর জমি মাত্র এক টাকার বিনিময়ে দশ হাজার আম লিচুর বাগান কেটে সাফ করে তাদের দেওয়া হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে জমি দেওয়া হল যার নীচে রয়েছে কয়লাখনি।একই ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে ৩৫০০ একর জমির গাছ কেটে।ছত্রিশগড়ে জঙ্গল যার নীচে রয়েছে কয়লার বিশাল সম্ভার তা দেওয়া হয়েছে। জনবহুল এলাকায় সিমেন্ট তৈরীর কারখানার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আশেপাশের বসতির মানুষ শ্বাসকষ্টে ভুগবেন।

হাজার হাজার কোটি টাকা তারা নিজেদের কোনও কোম্পানি থেকে বিনিয়োগ করবে না। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের ব্যবস্থা সরকারই করে দেবে। সরকার তাদের পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন, রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশন এর মতো সরকারী সংস্থার মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে। এসব জায়গায় আমার আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা রয়েছে। অর্থাৎ জনগণের টাকায় আদানীরা ব্যবসা করবে আর তার জন্যে ফল ভুগবে জনগণ। এই অর্থ আদৌ শোধ হবে কিনা তার কোনও গ্যারান্টি নেই। বিজয় মাল্য,নীরব মোদী,মেহুল চোস্কীর কথা নিশ্চই আমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাইনি।

মহারাষ্ট্রের ধারাবী বস্তির পূণর্নির্মাণ প্রকল্প দুবাই এর সংস্থার কাছ থেকে ঘুরপথে কেড়ে আদানীদের দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৪০ হেক্টর জমি এভাবেই বাগিয়েছে আদানী রিয়েল এস্টেট।

গত দশ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের খাতা থেকে ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের ১০,০০,০০০ কোটি টাকার ঋণ রাইট অফ করা হয়েছে , যাদের মধ্যে আদানি অন্যতম ।আরেকটি ক্ষেত্রে সরকার আদানীদের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে নেওয়া দশটি কোম্পানির ৬১,৮৩২ টাকার ঋণের মধ্যে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা মকুব করে ১৫,৯৯৭ কোটি টাকায় রফা করে আদানীদের হাতে তুলে দেয়।প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া কি ব্যাঙ্ক নিজ ইচ্ছায় একাজ করতে পারে? ভুলে গেলে চলবে না এই টাকা আমাদের মত মানুষের টাকা, মোদীর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়।এসবের ফলেই কোবিদের সময় আদানীদের সম্পত্তি তিনগুণ বেড়েছিল ও বিশ্বের ধনীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল।এসব লিখলে আদানীদের মানহানি হচ্ছে তাই সরকারি ফরমান আদানীদের সঙ্গে মোদীর বিশেষ সম্পর্ক সংক্রান্ত কিছু লেখা বা বলা যাবে না।আসলে মোদী যদি মুখ হয় তবে আদানী তার মুখোশ।

ভাষাগত মৌলবাদ, বাংলা ভাষা ও আমরা

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে সকল মানুষই আপন মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। মাতৃভাষার প্রশ্নে সকল মানুষই খুবই স্পর্শকাতর। মাতৃভাষা অসম্মানিত হলে তার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার প্রমাণ হোল অবিভক্ত পাকিস্থান। অবিভক্ত পাকিস্থানে বাংলাভাষাভাষী মানুষরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তথা তাদের মাতৃভাষাগত ভাবাবেগকে মর্যাদা না দিয়ে, পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী

সংখ্যালঘু উর্দূ ভাষাভাষীদের অন্যায় দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উর্দূকে গোটা অবিভক্ত পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করে ।পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ভাষাগত অধিকারকে অবদমিত করে।

স্বভাবতঃই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিক্রিয়া হিসাবে পদ্মা--মেঘনা--যমুনা; কপোতাক্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। শুরু হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাল), যার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সফলতা তথা স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সরকার এই ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেছেন। তাই আমরা লক্ষ্য করি যে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের মধ্যে ভাষাগত ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে সংখ্যাগুরু--সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হবার বহু পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংবিধানের মধ্যে সকল মানুষের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সংবিধান গৃহীত হয় তার ভিতরে সকল ভাষার মর্যাদা রক্ষিত হয় ।বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ছোট বড় নির্বিশেষে সকল ভাষাগত জনগোষ্ঠীর ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ঠিক একইভাবে, বহুভাষাভাষী মানুষের দেশ সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় ও প্রাদেশিক সংবিধান (Contonal Constitutions) সমূহের মধ্যে সকল ভাষাভাষী মানুষদের ভাষাগত আত্মপ্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সমাজতান্ত্রিক জার্মানী প্রমুখ দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হোল বিভিন্ন ভাষা উপভাষার এক যাদুঘর। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গান লিখেছেন যে "India is a museum of various languages and dialects" অর্থাৎ ভারতবর্ষ হোল বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার যাদুঘর। স্বভাবতঃই ভারতের গণপরিষদে যখন আমাদের সংবিধান রচিত হয়, তখন আমাদের গণপরিষদ সভ্যদেরকে ভাষাগত বহুত্ববাদের কথাটি মনে রাখতে হয়। উল্লেখ্য যে হিন্দিতে আমাদের দেশের বৃহৎ অংশের লোক তখন কথা বোলতো। 30% -এর মত। অন্যান্য ভাষা উপভাষায় কথা বোলতো কমবেশী 70%-এর মতো মানুষ। আম্বেদকর প্রমুখ হিন্দিবলয়ের সভ্যরা হিন্দি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কথা বলেন। কিন্তু ভি. ভি. গিরি প্রমুখ অধিকাংশ দক্ষিণভারতীয় সভ্যরা ইরাজীকেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে বলেন যে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মাতৃভাষা হলেও, দীর্ঘ পৌণে দুশো বছর ধরে তাদের শাসন এদেশে থাকার ফলে, এটি গোটা দেশের একটি সংযোগ সৃষ্টিকারী ভাষায় বা "link language"-এ পরিণত হয়েছে। অতএব ইংরাজীকেই রাষ্ট্রভাষা করা হোক।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান মূলতঃ ভি. ভি. গিরির প্রস্তাবকেই সমর্থন করে কিছু সংশোধিত আকারে বলেন

(ক) ছোটবড় সকল ভাষা--উপভাষাকে রক্ষার ও তাদের বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) বড় বড় জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে সংবিধানে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(গ) ত্রিভাষা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ হিন্দি, ইংরাজী ও সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক ভাষায় সরকারী কাজকর্ম পরিচালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডঃ রাধাকৃষ্ণানের প্রস্তাব সংবিধানে গৃহীত হয়। এইভাবে উগ্র হিন্দীপ্রেমী ও হিন্দী বিরোধীদের মল্লযুদ্ধের অবসান হয়। সংবিধানের মধ্যে সেইমতো বিভিন্ন ধারা উপধারা লিপিবদ্ধ হয়। সংবিধানের ২৯নং ধারার মধ্যে সকল জনগোষ্ঠীর ভাষাগত অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে "Any section of the citizens ... having a distinct language– script or cluture of its own shall have the right to conserve the same." সংবিধানের অষ্টম তপশীলে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া সহ ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল ।পরে আরো কিছু ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে এখন মোট সরকারি ভাষা হলো ২২টি। এই ২২টি সরকারি ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চলে। অর্থাৎ হিন্দী, বা ইংরাজী, বা স্বীকৃত ২২টি প্রাদেশিক ভাষার যে কোন একটিতে একজন ভারতীয় নাগরিক তাঁর সরকারী কাজকর্ম করতে পারেন।

এইভাবে এই এতকাল চলে আসছে। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রের বি. জে. পি সরকার তার রাজনৈতিক শ্লোগান ক্ষুহিন্দী, হিন্দু, হিন্দুস্থানক্ষু তত্ত্ব কে বাস্তবায়িত করতে চাইছে। তারা চায় দেশটিতে থাকবে একটিমাত্র ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ হিন্দুরা, একটিমাত্র ভাষার মানুষ অর্থাৎ হিন্দীভাষীরা, আর দেশটির নাম হবে হিন্দুস্থান। বি. জে. পি তার এই দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণ করতে চাইছে এবং তার জন্য জোর করে হিন্দী ভাষাকে অহিন্দী ভাষীদের উপর চাপাতে চাইছে। এই প্রক্রিয়ায় তারা এখন টার্গেট করেছে বাঙালী ও বাংলাভাষাভাষী মানুষদেরকে। মনে রাখতে হবে যে যে কোনও সুস্থ চিন্তার মানুষ সকল ভাষাকেই শ্রদ্ধা করেন, আমরাও করি। ভাষার কোনও জাত নেই, কোনও ধর্ম নেই। কোন মতবাদই নেই। ভাষা হোল নিরপেক্ষ। ভাষা হোল যে কোন মানুষের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। এই কথাগুলি মাথায় রেখেই বলি যে হিন্দী অবশ্যই বাংলা, বা উর্দূ, ইত্যাদির মতো একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এই ভাষায় ভারতের সবচাইতে বেশী সংখ্যক লোক অর্থাৎ 30% লোক কথা বলে, অন্য কোনও ভাষাতেই এত বেশী সংখ্যক লোক কথা বলে না।

এসব সত্বেও এটা একটি অপ্রিয় সত্য যে হিন্দী ভাষা অন্য কোনও রাষ্ট্রে প্রভাবশালী অংশের মানুষের ভাষা নয়। অথচ বাংলা বা তামিল সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। তামিল শ্রীলঙ্কার জাফনা প্রদেশ সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনগণের ভাষা। বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। এখন দুর্ভাগ্যের কথা হোল এই যে সংকীর্ণ হিন্দী আধিপত্যবাদ ও হিন্দু মৌলবাদের মিথক্রিয়ায় অন্ধ হয়ে বি. জে. পি সরকার ও বি. জে. পি অনুগামী মানুষরা দেশের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পেটের দায়ে কাজ করতে যাওয়া বাংলাভাষী মানুষদেরকে হয়রানি করছে। তাদেরকে বাংলাদেশী অর্থাৎ বিদেশী আখ্যা দিয়ে মেঘনা--পদ্মা--কপোতাক্ষের মাটিতে জোর করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা মানব সভ্যতার লজ্জা। ভারতের সংবিধানের ১নং ধারায় বলা আছে, "India– that is Bharat –shall be a union of ÞÝþ –" অর্থাৎ ভারত হোল একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য হোল পশ্চিমবাংলা যেখানকার মানুষের মাতৃভাষা হোল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রীলি বাংলাদেশের জনগণের মাতৃভাষার মতোই বাংলা ভাষা। অথচ, ভিনরাজ্যে কর্মরত বাংলাভাষাভাষী মানুষদেরকে বিদেশি (বাংলাদেশী) বলে জোর করে বাংলাদেশে "push Back" করে দেওয়া হচ্ছে। আর মুসলিম হলে তো কথাই নেই।

এই বর্বরতা চলছে এখন আমাদের গোটা দেশে। বি. জে. পি একই সঙ্গে একঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে--

(১) জোর করে সুকৌশলে অহিন্দীভাষী মানুষদের উপর হিন্দীটা চাপাতে চাইছে এবং

(২) বেছে বেছে অহিন্দীভাষাভাষী তথা অহিন্দু ভিন্নভাষী মানুষদেরকে ভারতছাড়া করতে চাইছে। তার এই সর্বনাশা নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদেরকে গর্জে উঠতে হবে এবং জনবিরোধী সরকারকে বাধ্য করতে হবে সকল ভাষা ও উপভাষার বিকাশ তথা সমমর্যাদার ব্যবস্থা করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে এবং রবীন্দ্রনাথ ; নজরুলের দেশের মাটিতে বাসবাসকারী সকল মানুষকে যথোপযুক্ত সম্মান ও সুরক্ষা প্রদান করতে হবে ।

এটাই সময়ের দাবী।

(লেখক কোলকাতার সাউথ সিটি (দিবা) কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ।)

'স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধটি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

মহাত্মা গান্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

''যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়।....আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই ;কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ।যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি,সঞ্চরণ করছি,সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ,যাঁর তুলনা নেই,তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন,আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের।কেননা , আমাদের মন ভীরু অস্বচ্ছ,স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল।.....বারে বারে এমন ঘটেছে,যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

.....খ.....কত পীড়া,কত অপমান তিনি সয়েছেন

তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস।দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়,দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে।তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়সুখের জন্যেণ নয়,স্বার্থের জন্যে নয়,সকলের ভালোর জন্যে।এই- যে এত মার খেয়েছেন,উল্টে কিছু বলেননি কখনো,রাগ করেননি।জ্জসমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন।শত্রুরা আস্চর্য হয়ে গেছে ধইর্য দেখে,মহত্ব দেখে।ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা,তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন।

.....সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিম রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে;একটি নাম দিয়েছে,মহাত্মা'।

(কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর' চারিত্রপূজা' পর্যায়ের রচনায় গৌতম বুদ্ধ ,যীশুখ্রিস্ট ,রাজা রামমোহন রায় , পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধি - এই মহাপুরুষদের প্রতি পূজা নিবেদন করেছেন।তাঁর সেই রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।)

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও কবির মতন বলেছিলেন 'ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়ে ভাববে,একদা এই পৃথিবীর মাটিতে এমন এক মনীষী চলাফেরা করতেন যাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি '। গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা, রোমা রোঁলা,জর্জ বার্নার্ড শ,বার্ট্রান্ড রাসেল, জুনিয়র মার্টিন লুথার কিং,নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ।

পরিশেষে একটি কথা বলে শেষ করব।৩০ জানুয়ারী তাঁকে হত্যার ১০ দিন আগে ২০ জানুয়ারি একবার একই প্রচেষ্টা হয়,বোমা নিক্ষেপ করে মদনলাল পাহায়া গ্রেফতার হয়।বোমাটি লক্ষভ্রষ্ট হয়।অসংখ্যবার অনুরোধ সত্বেও গান্ধিজি নিরাপত্তা রক্ষী নিতে অস্বীকার করেন।এমনকি তিনি তাঁর প্রার্থনা সভায় আগত লোকদের

search করতেও বারণ করেন।তিনি বলেন 'হিংসার সহায়তা নিয়ে(পুলিশ) জীবন ধারণ করলে মানুষ তাকে দুরাত্মা বলবে'।তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন।

এই জন্যই তিনি
'মহাত্মা'।তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।
গান্ধী মহারাজ
--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী,কেউ-বা
নিঃস্ব
এক জায়গায় আছে মোদের মিল
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষনডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডান্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লোম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয়না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিনবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ--
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে
গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন।শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০
হরিণবাড়ি---প্রেসিডেন্সি জেল।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান পথ প্রদর্শক

পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০-১৮৯১)

নারায়ণ দেব

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মদিবস। সেই উপলক্ষে তাঁর বিচিত্র কর্মমুখর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কার্যসমূহ

বিধবা- বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। বিধবা বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন । হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিধবা বিবাহের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে।প্রতিবাদীদের প্রত্যুত্তর দানের জন্য তিনি ১৮৫৫'র অক্টোবর মাসে উপরোক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাসের জন্য ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাঁর পক্ষ থেকে একটি আবেদন পত্র পেশ (১৮৫৫)করা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ থেকেও সরকারের কাছে বিপরীত আবেদন পত্র দাখিল (১৭ই মার্চ, ১৮৫৬)করা হয়। বহুবিধ বিচার বিশ্লেষণের পর সরকারের ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া গ্রহণ এবং ২৬শে জুলাই, ১৮৫৬ গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয় ।

আইন অনুযায়ী প্রথম বিধবা বিবাহ করেন (৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬) অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই বিবাহ ছাড়াও এরপর বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরচন্দ্রের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে বহু বিধবা বিবাহ নিস্পন্ন হয়। ৬০টি বিধবা বিবাহ দিতে গিয়ে তাঁর প্রায় ৮২০০০ টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং তাঁকে ঋণভারে জর্জরিত হতে হয়েছিল। ১৮৭০ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র স্বেচ্ছায় এক বালবিধবার পাণিগ্রহণ করলে তাঁর ব্রত সার্থকতা লাভ করে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন 'করুণাসাগর'। তাই চোখের সামনে বাঙালি সমাজে বালবিধবাদের দুরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। এই কারণে বিধবা বিবাহের জন্য 'সর্বস্বান্ত' হতে, এমনকি 'প্রাণান্ত' স্বীকারেও কখনো পরাঙ্মুখ হন নি।

তিনি বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘ কাল সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৭১ সালে জুলাই মাসে বিদ্যাসাগর 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এত দ্বিষয়ক বিচার ' শীর্ষক প্রথম পুস্তিকা এবং বহু বিবাহ সমর্থনকারীদের

মত খণ্ডন করে ১৮৭৩ মার্চে উপরোক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রতিপক্ষ পণ্ডিত মহল এসব পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশের জন্য তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলে তৎকর্তৃক 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ' এই ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) শীর্ষক বিদ্রূপ কৌতুকে পরিপূর্ণ দুই খানি প্রতি আক্রমণ রচনা করেন। 'বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ' রোধকল্পে আইন প্রণীত না হলেও এসব প্রথার বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত প্রচেষ্টার প্রায় আশি বছর পরে স্বাধীন ভারতে ১৯৫৩ সালে বহু বিবাহ প্রথা আইন পাশ করে রহিত করা হয়।

' নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি ও নারী মুক্তির জন্য সংগ্রাম'

নারীজাতির দুর্গতিমোচনের জন্য বিদ্যাসাগরের ছিল আজীবন নিরন্তর ও নিরলস প্রয়াস। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ।' তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ এবং বিধবা-বিবাহের মত শিক্ষামূলক ও সামাজিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, চেয়েছিলেন এই দুর্ভাগা দেশে শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের সবরকমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত নারীজাতিকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলার সাহসী সংকল্পে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। তর্ক ও যুক্তিজাল বিস্তার করে কুসংস্কারের ঘেরাটোপ ছিন্ন করেছেন। নিজের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন,'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। ' চিঠিতে ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছেন, 'বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।'

এ সম্বন্ধে 'চারিত্রপূজা' নিবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'অবশেষে তিনি (ঈশ্বর চন্দ্র) যখন বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন,তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গাল মিশ্রিত এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।'

বিদ্যাকে মূলধন করে ব্যবসা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সাফল্য

ঊনবিংশ শতাধীতে বাংলার নবজাগরণে স্বাধীন বাণিজ্য বৃত্তির উন্মেষ ঘটে। তাঁরা বণিকের মত বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বাণিজ্য করেছেন। এ সময়ের বাণিজ্যমেধায় শ্রেষ্ঠ কৃতি পুরুষরা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।তবে অন্যদের থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রম এইজন্য যে অন্যদের মত তিনি বিত্তবান ছিলেন না, তিনি বিদ্যাকে মূলধন করে ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটরি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। জনসাধারণ ও ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনে তিনি ১৮৪৭ সাল থেকে বই লিখতে শুরু করেছিলেন, ফলে তিনি হলেন একাধারে গ্রন্থকার, মুদ্রক ও প্রকাশক।

বর্তমান কালের খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক শ্রীঅমিত্র সূদন ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন যে, 'বিদ্যাসাগরের বই সে যুগে হাজার হাজার কপি বিক্রি হত। সে যুগের বই-এর বাজারে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। প্রথম কুড়ি বছরের মধ্যে 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগের যাটটি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল।...' পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, '(শুধু) পুস্তক বিক্রয় হইতে তাঁহার প্রতি মাসে ৫/৬ হাজার টাকা আয় হইত।'বলা বাহুল্য, মহান আত্মা বিদ্যাসাগর তাঁর এই ব্যবসালব্ধ অর্থ সমাজ ও আর্তের সেবায় সারা জীবন ধরে অকাতরে ব্যয় করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গি

বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনের প্রসার ও পরিধি পরিমাপ করতে হলে একটা গ্রন্থই রচনা করতে হয়। যাইহোক, 'বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ, সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে।' বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন কৌলিক আচারনিষ্ঠ সনাতন রাঢ়ীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে; পিতামহ প্রচার করেছিলেন 'এঁড়ে বাছুর' জন্মেছে বলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এই অবমানিত দেশে' এ জন্ম 'বিধাতার নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম'। হ্যাঁ, আশ্চর্য তো বটেই, না হলে সাড়ে তিন কোটি দেবদেবী বেষ্টিত হিন্দু বাঙালি সমাজকে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার পাঠ দিলেন কীভাবে? তিনি কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করে একাজ করেন নি। জেদ ও যুদ্ধে তিনি ছিলেন একক। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে সুস্থ মানবিকতাবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন আজীবন একাগ্রচেষ্ট। তাই গোটা উনিশ শতকের সংস্কারমুক্ত আধুনিক মানসিকতার উদ্গাতা বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর নিঃসংকোচে বলতে পেরেছিলেন, 'আমি দেশাচারের দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহাই করিব- লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।' রবীন্দ্রনাথের শেষ বিচার, 'যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।' অতএব

রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, 'এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।'

কেবল পাশ্চাত্যের জ্ঞানার্জন স্পৃহার জন্যই নয়, মানুষটি যে আধুনিক তার আরও প্রমাণ হাজির করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই (ও বৈদ্যদেরও) প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।' তিনি আজীবন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। 'সর্ব শুভকরী' নামক একটি সংবাদপত্রে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বালিকাদের চৌদ্দ বছরের পূর্বে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তিনি নিজের কন্যাদের ১৫/১৬ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ দেননি , যা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একান্তভাবেই প্রথাবিরুদ্ধ বলে গণ্য হত।

বিদ্যাসাগর জীবনব্যাপী যে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলেন, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। পরিসর স্বল্প, তাই আবার সেই কবিগুরু'র একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করছি।

'সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় ও নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ-স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন- এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।'

জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

জরুরি অবস্থা ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত

জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণ যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা যে কষ্টকল্পিত ও অবাস্তব ছিল পরবর্তীকালের ঘটনাবলিতে তা প্রমাণিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মদতপুষ্ট কোনও সামরিক অভ্যুত্থান, ক্ষমতা দখল ও পরবর্তীকালে এমনকী ইন্দিরা গান্ধিকেও উচ্ছেদ করে ভারতে একদলীয় কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এরকম কোনও প্রচেষ্টা হয়েছিল বলেও জানা যায়নি। কখনই তৃতীয় দুনিয়ার কোনও দেশে সেভিয়েত ইউনিয়ন এরকম কোনও প্রচেষ্টা করেনি।

অপরদিকে ইন্দিরা গান্ধি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে ও সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির পিছনে যে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র (পড়ুন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) ছিল বলে মনে করতেন তার যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি ছিল। ১৯৭৫-এর জুন মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এর পিছনে পাক-মার্কিন চক্রের মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তি ছিল তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না।

জরুরি অবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল বলে পাশ্চাত্য দুনিয়া মনে করতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকও তাদের মার্চ, ১৯৭৬-এর রিপোর্টে একথা স্বীকার করে। যদিও ইন্দিরা গান্ধি পাশ্চাত্যের এই উদারনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে উদাসীন থাকাই পছন্দ করতেন। উপরন্তু তাদের সমালোচনায় তিনি অত্যন্ত রুষ্ট ছিলেন। যদিও তাদের অনুমোদনও তিনি মানসিকভাবে চাইতেন। যার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও ওই সময়ে তিনি বিরাট সংখ্যাক পশ্চিমি সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারগুলিতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমের দেশগুলি তাঁকে স্বৈরতন্ত্রী বা একনায়কতন্ত্রী বলে যে অভিযোগ ও সমালোচনা করছিলো সেই বিষয়টি সম্পর্কে জবাব দেনজ্জ তিনি অভিযোগ করেন যে এরা ভন্ড ও দ্বিবিধ নীতি অনুসরণ করছেন জ্জ জরুরী অবস্থা প্রসঙ্গে তাদের সমালোচনা ও ভারতীয় গণতন্ত্র নিয়ে তাদের অশ্রু বিসর্জন সম্পর্কে তিনি বলেন যে এই অবস্থা একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র জ্জ কিন্তু বছরের পর বছর এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার ঘৃণ্য সামরিক সরকারগুলিকে এই তথাকথিত পশ্চিমি গণতন্ত্রের দেশগুলি যে টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্রের মদত দিয়ে আসছে ও মানুষের ও কণ্ঠরোধ করে এসেছে সে বিষয়ে তিনি বারবার উল্লেখ করতেন। পাকিস্তানের মিলিটারি একনায়কদের যে আমেরিকা বারবার সমর্থন করেছে, এমনকী ১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যার সময়েও, সেকথা তিনি উল্লেখ করেন। শ্রীমতী গান্ধি একথাও উল্লেখ করেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড ভারত সফর বাতিল করে চিনে যান। ওখানে তখন গ্যাং অব ফোরের (দুষ্ট চতুষ্টয়) রাজত্ব চলছে। কী সুন্দরভাবে আড়ম্বর সহকারে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের এই চিন সফরকে পশ্চিমি মিডিয়া প্রচার করে। চিনের জনসাধারণ এমনকী চিনের ওই শাসকদের সমর্থকরাও দাবি করেন না যে ওই দেশে গণতন্ত্র আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিনা

একনায়কতন্ত্র পশ্চিমি শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর ভারতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদের ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টাকে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিহত করলে তা নাকি অগণতান্ত্রিক।

ইন্দিরা গান্ধি এই সব সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন এটা কোন ধরনের বৌদ্ধিক বা অন্য যে কোনও ধরনের সততা?

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবেশী বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান, সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্ষমতা দখল, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কখনই কোনও প্রতিবাদ জানায়নি। পরবর্তীকালে মোরারজি দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে যে জনতা সরকার গঠিত হয় তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের জিয়াউল হক-এর সামরিক সরকার ও বাংলাদেশের জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার-এর খুবই খুবই ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি দেশের সরকারই ছিল ইসলামিক মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মার্কিন মদতপুষ্ট। তাতে মোরারজি-বাজপেয়ী জুটির কোনও অসুবিধা হয়নি। পাক জেনারেল জিয়ার অত্যাচারের ফলে যে সকল বালুচ বিদ্রোহী এবং জিয়ে সিন্ধ আন্দোলনের সংগঠকরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মোরারজি-বাজপেয়ী সরকার ধরে ধরে জেনারেল জিয়ার হাতে তুলে দেয়। জিয়া তাদের নির্বিচারে হত্যা করে। পাক জেনারেল জিয়া ওই সময়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ী যদি স্বাধীনতার পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতেন তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতে কোনও বিবাদ ও সমস্যা থাকত না, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জরুরি অবস্থার প্রথম পর্যায়

জরুরি অবস্থার প্রথম পর্যায়ে নিয়ানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারি প্রশাসন সময়ে কাজ করছিল। ইন্দিরা গান্ধি ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচি গরিব ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল। সিপিআই দল ২০ দফা কর্মসূচির সমর্থনে সাধ্যানুযায়ী প্রচার চালায়। কেরলের অচ্যুৎ মেননের নেতৃত্বাধীন সিপিআই-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার ১৯৭০ সাল থেকে শৃঙ্খলার সঙ্গে ভূমি সংস্কার সহ যে সব মৌলিক দ্রারিদ্র মোচন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তা ইন্দিরা গান্ধিকে প্রভাবিত করেছিল। বিশিষ্ট গান্ধিবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনোবা ভাবে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন 'কঠোর অনুশাসন পর্ব'।

জরুরি অবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়

জরুরি অবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় ও জনমুখী কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল তা শিথিল হতে শুরু করে। সঞ্জয় গান্ধি যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা কর্মসূচি উপস্থিতকরেন। ২০ দফা কর্মসূচি শিথিল হতে শুরু করে। পাঁচ দফা কর্মসূচির মধ্যে ছিল বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, শহর পরিস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, স্বাক্ষরিত প্রভৃতি। এর মধ্যে শহর পরিষ্কার ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ওপর প্রবল গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জবরদস্তিপূর্বক ভেসেকটমি ও টিউবেকটমি করানোর অভিযোগ উঠতে থাকে। শহর পরিষ্কার - এর নামে জোর করে রাস্তার ধারের দোকানপাট ও গরিব মানুষের ঝুপড়ি উচ্ছেদের অভিযোগ ওঠে।দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলাস্তরে এই অভিযোগ উঠতে থাকে। বহু রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাও সঞ্জয় গান্ধি সম্পর্কে অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকেন।

সিপিআই-এর সঙ্গে বিরোধ

এই সময়ে সিপিআই-এর সঙ্গেও কংগ্রেসের (পড়ুন ইন্দিরা গান্ধি) মতপার্থক্য শুরু হয়। সিপিআই-এর অভিযোগ ছিল ২০ দফা কর্মসূচি ও তার রূপায়ণ গুরুত্বহীন করে দিয়ে তথাকথিত পাঁচ দফা কর্মসূচিতে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। পাঁচ দফা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য জবরদস্তি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ওপর পরিবার পরিকল্পনা ও শহর পরিষ্কারের নামে আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়ে শিল্পশ্রমিকদের প্রদত্ত বোনাস বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সিপিআই ও এআইটিইউসি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এস এ ডাঙ্গে সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে একচেটিয়া পুজিপতিদের ও বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানীকে বোনাস প্রদান। ইন্দিরা গান্ধি ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচি রূপায়ণের দাবিতে সভা সমাবেশ ও আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক সিপিআই. কর্মী ও নেতা গ্রেফতার হন।

জরুরি অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

জরুরি অবস্থার সময়ে সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা, বিরোধী দলগুলির বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বিনা বিচারে গ্রেফতার কার্যত বিরোধীদের মত প্রকাশের সুযোগকে স্তব্ধ করে দেয়।

ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, আনন্দমার্গ, জমায়েত-ই-ইসলামি প্রভৃতি সংগঠনকে বে-আইনি ঘোষণা করেন। কিন্তু সংগঠন কংগ্রেস, ভারতীয় লোকদল, সোশ্যালিস্ট পার্টি, স্বতন্ত্র দল এমনকী জনসংঘ দলকেও বে-আইনি ঘোষণা করেননি। প্রথম চারটি দল ক্যাডারভিত্তিক দল নয়। এই দলগুলির নেতারা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পঞ্চম দল জনসংঘর মূল ভিত্তিই ছিল আর এস এস কর্মীরা। আর এস এস বে-আইনি হওয়ায় এই দলও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের ওপর এই ধারণা ক্রমাগত বদ্ধমূল হতে থাকে যে দেশে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। ১৯৭৬-এর মার্চ মাসে যে লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সংসদে দুবার আইন প্রণয়ন করে সংসদের মেয়াদ প্রথমে এক বছর ও পরে আরও এক বছর বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচন না করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। (ক্রমশ)

১৯৭২ এ গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে কারা ? কেনো ?

জাকির তালুকদার

১৯৭২-এর সংবিধান ঘোষিত হবার পরে কোনো বিরোধী দল কি সেই সংবিধানের বিরোধিতা করেছিল ?

আমি সিপিবি-ন্যাপের কথা বলছি না।

বলছি মওলানা ভাসানীর কথা? তাঁর দল কি সেই সংবিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল ? বদরুদ্দীন উমরের দল ? অথবা ব্যক্তিগতভাবে উমর নিজে ? রনো-মেননের দল ? অধ্যাপক আহমদ শরীফ ? আহমদ ছফাদের প্রতিষ্ঠিত লেখক শিবির? হলিডে-র এনায়েতুল্লাহ খান? সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি ?

সেই সময়ের প্রধান বিরোধী দল জাসদ ?

মনে করিয়ে দিই, বাকশাল গঠনের আগ পর্যন্ত অনেক পত্রিকা চালু ছিল। হলিডে-র কথা আগেই বলেছি। জাসদ-র গণকণ্ঠ ছিল, মওলানা ভাসানীর 'হককথা' ছিল। আরো বেশ কয়েকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল যারা সরকারবিরোধী ভূমিকা পালন করত। তারা কি বাহাত্তরের সংবিধানের বিরোধিতা করেছিল ?

একটি ধারা নিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আর কারো কোনো বিরোধিতার কথা আমার জানা নেই। আমার জানার বাইরে থাকতে পারে। সেগুলো জানালে সমৃদ্ধ হবো।

১৯৭২-এর সংবিধান প্রণীত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিদের দ্বারা। সেটাই সবদেশে হয়ে থাকে। চার মূলনীতির ভিত্তিতে এবং লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে, সেটাই ছিল বিজয়ী পক্ষের ঘোষণা। যদিও শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ কখনোই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু দুইটি প্রধান কারণে সেটিকে তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল। প্রথম কারণটি মুক্তিযুদ্ধের সময় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশে না দাঁড়ালে বাংলাদেশ ঐ সময়ে স্বাধীন হতো কিনা বলা কঠিন। আমেরিকা ও চীনের হুমকি উপেক্ষা করে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানো কঠিন ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইয়াংসি নদী বরাবর চীনের সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছিল। চীন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জড়ালে সোভিয়েতও চীনকে আক্রমণ করবে, এটাই ছিল সৈন্য সমাবেশের কারণ। আর বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠিয়েছিল ব্যাপক ডেস্ট্রয়ার এবং যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত নৌবহর। পৃথিবী এক পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। এই আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাবক ভূমিকা আওয়ামী লীগকে সমাজতন্ত্র শধটি গিলতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয়টি ছিল আওয়ামী লীগের ভেতরে, প্রধানত ছাত্রলীগের বামপন্থি অংশ। তারা সমাজতন্ত্রের জন্য চাপ দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। এই অংশটি পরবর্তীতে জাসদ গঠন করে। তারা মুজিব সরকারের বিরোধিতা করেছে সর্বাত্মকভাবে। তবে সংবিধানের বিরোধিতা করেনি।

এই সংবিধানের চার মূলনীতি মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি বলে পরিচিতি লাভ করলেও আসলে তা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালনার মূলনীতি।

এই চার নীতির সমষ্টিকে যারা এখন মুজিববাদ বলে প্রচার করছে, তারা জানে না ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্টের আগে কখনোই এগুলোকে মুজিববাদ বলা হয়নি। এমনকি পরেও বলা হয়নি।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের বইটি ছাড়া আর কোথাও মুজিববাদ ছিল না। বঙ্গবন্ধু নিজে এই শধটি চালু করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। উৎসাহী হলে সেই সময় সবাই এই শধটি তসবিহ ছাড়াই জপ করত।

এই শধটিকে সামনে আনা হয়েছে ২০২৪-এর ৫ই আগস্টের পর। জামায়াত এবং চরম ডানপন্থি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কিছু গ্রুপ এই প্রচারণার উদ্যোক্তা। তারা ১৯৭২-এর সংবিধানকে মুজিববাদী সংবিধান বলে প্রচার করছে নিজেদের মতো সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু বামপন্থি এদের সাথে গলা মেলাচ্ছে কেন ?

উত্তর-- এরা নিজেদের বামপন্থি বলে পরিচয় দিলেও বামপন্থার প্রজ্ঞা, ইতিহাসচেতনা অর্জন করতে পারেনি।

স্মরণ

ফরিদা পারভিন

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতশিল্পী ফরিদা পারভীন গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ । তিনি লালনগীতির জন্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁকে 'লালনকন্যা' ও 'লালন সম্রাজ্ঞী' হিসেবেও অভিহিত করা হয় । সঙ্গীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ১৯৮৭ সালে একুশে পদক ও ১৯৯৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ফরিদা পারভীনের কর্মজীবন সঙ্গীতময় ।ফরিদা পারভীনের গাওয়া আধুনিক, দেশাত্মবোধক কিংবা লালন সাঁইয়ের গান সমানভাবেই জনপ্রিয় ।তাঁর জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা-সুরমা নদীর তটে' 'তোমরা ভুলেই গেছো মল্লিকাদির নাম', 'নিন্দার কাঁটা যদি না বিঁধিল গায়ে প্রেমের কী সাধ আছে বলো', 'খাঁচার ভিতর', 'বাড়ির কাছে আরশি নগর' ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এই বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের কাছ থেকে গৃহীত সাক্ষাৎকারটি আমরা প্রকাশ করলাম।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ১ লালন ফকির ও ফরিদা এ দুই সমার্থক। এ সম্পর্কে আপনার মতামত।

তানভীর মোকাম্মেল এ কথাটা বোধহয় কিছুটা আবেগের অবস্থান থেকে বলা। এটা ঠিক ফরিদা পারভীন লালন ফকিরের গানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অসামান্য ভংমিকা রাখেন। সে কারণে আবেগবশত কেউ তলালন ও ফরিদা পারভীন সমার্থকদ এরকম কথা বলতে পারেন বটে, তবে মনে রাখতে হবে এঁরা দু'জন দুই শতকের, দুই ভিন্ন ঘরানার, দুই মাপের দু'জন ভিন্ন মানুষ।

অসংখ্য বাউল গানের স্রষ্টা লালন ফকির ছিলেন মূলত একজন বাউল-দার্শনিক ও গীতিকার। বাংলায় বাউল গানের ঐতিহ্য কয়েক শ' বছরের। অসংখ্য পদকর্তা বাউল গান লিখেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে লালন ফকির ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচে প্রতিভাবান, সবচে দর্শনমনস্ক ও সবচেয়ে সৃজনশীল শিল্পী। অন্য দিকে ফরিদা পারভীন একজন কণ্ঠশিল্পী যিনি রেডিও, টেলিভিশন ও অনুষ্ঠানে লালন গীতি গাইতেন। বাংলায় বাউলেরা ছাড়াও অনেক মধ্যবিত্ত শিল্পীরাই লালনের গানের মানবিক আবেদনে মুগ্ধ হয়ে লালনের গান গেয়েছেন। কিন্তু কেউই ফরিদা পারভীনের মতো এমন গীতিময়তার সঙ্গে, এমন সুরেলা দরদের সঙ্গে লালনের গান পরিবেশন করতে পারেননি। সে কারণে লালনের গানের জগতে ফরিদা পারভীনের একটা আলাদা আবেদন সব সময়ই রয়ে যাবে।

প্রশ্ন ২ আপনার তঅচিন পাখীদ প্রামাণ্যচিত্রটা শুটিং-য়ের সময় ফরিদা পারভীনকে নিয়ে কোনো বলার মতো কোনো স্মৃতি আছে কী ?

তানভীর মোকাম্মেল ফরিদা পারভীন আমার তিনটে ছবির জন্যে গান গেয়েছেন। লালন ফকিরকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তঅচিন পাখীদ-তে তো বটেই। তার আগে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাহিনীচিত্র তদীর নাম মধুমতীদ ও লালন ফকিরের জীবন ও দর্শন নিয়ে তৈরী তলালনদ চলচ্চিত্রে। ফলে ওঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছু স্মৃতি রয়েছে। তঅচিন পাখীদ শুটিংয়ের সময়ের একটা স্মৃতি বলি। উনি তখন কুষ্টিয়ায় থাকতেন। আমরা ওঁর বাড়ীতে গেছি ওঁর সাক্ষাৎকার ও গান শুট করতে। উনার জীবনযাত্রা ছিল একান্তই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহিণীসুলভ। মনে আছে আমাদের শুটিংয়ের চেয়ে ওদিন উনি গৃহিণী হিসেবে বেশী ব্যস্ত ছিলেন আমাদের কী খাওয়াবেন, কী দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করবেন, এসব নিয়ে। বারবার ছুটে রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন। হয়তো নিজে কিছু রাঁধছিলেন। বিষয়টা আমাদের শুটিংয়ে কিছুটা বিঘ্নই ঘটাচ্ছিল। শেষে আমাদের ইউনিটের বয়োজ্যেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান আনোয়ার হোসেন ভাই ওঁকে প্রায় ধমকেই বলে উঠলেন; তআপা, ওসব রান্না-বান্না বাদ দেন তো। শুটিংয়ে মনোযোগী হন।দ এরপরে উনি থিতু হয়ে বসে আমাদের ক্যামেরার জন্যে সাক্ষাৎকার দিলেন। গানও গাইলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ওঁর মনটা তখনও অতিথি আপ্যায়নে উদ্বিগ্ন হয়ে রান্নাঘরের দিকেই রয়েছে। ওঁর এই মানবিক সারল্য আমার বেশ ভাল লেগেছিল।

প্রশ্ন ৩ তাঁর প্রয়ানে লালন চর্চা কতটা টিকবে ?

তানভীর মোকাম্মেল ফরিদা পারভীন ছাড়াও আরো অসংখ্য শিল্পী লালনের গান করেন। দুই বাংলার শত শত বাউল-ফকিরেরা নিয়মিত লালনের গান গেয়ে থাকেন। লালনের গান প্রায় দুই শত বছর বেঁচে আছে। এবং আমার ধারণা তা আরো শত শত বছর বেঁচে রইবে। তবে লালনের গানের অত্যন্ত সফল গায়িকা হিসেবে আরেকজন ফরিদা পারভীন সহজে সৃষ্টি হবে না।

প্রশ্ন ৪ লালনের গানের আর কোনো যোগ্য উত্তরসূরী কি ফরিদা পারভীন বা অন্য কেউ তৈরী করতে পেরেছেন ?

তানভীর মোকাম্মেল লালনের গান নানাভাবেই গাওয়া হয়। মধ্যবিত্ত শিল্পীরা একভাবে গান, বাউল-ফকিরেরা আরেকভাবে গান। আসলে বাংলার বাউল গানের কিন্তু একটাই সুর নেই। বাংলার যে অঞ্চলে গানটা গাওয়া হচ্ছে লালনের গানে সে অঞ্চলের সুরটা প্রাধান্য পায়। গায়ক-গায়িকারা নিজেদের অজান্তেই হয়তো সেটা করে থাকেন। উত্তরবঙ্গে দেখি ভাওয়াইয়ার মত উঁচু নীচু সুরে লালনের গান গাওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গের বীরভংম-বাঁকুড়া অঞ্চলে ঝুমর সুরের প্রভাব বেশী আর আমাদের ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলে দোহারের প্রভাবটা বেশী দেখা যায়। ফরিদা পারভীন যে সুরে লালনের গান গাইতেন সেই সুরটা অনেকটাই সৃষ্টি করেছিলেন মকসেদ আলী সাঁই। ফরিদা পারভীন মকসেদ আলী সাঁইয়ের কাছ থেকে লালনের গানের শিক্ষণ পেয়েছিলেন। ফরিদা পারভীন, আমার জানা মতে, লালন গীতি পরিবেশনে ওঁর ধারার কোনো উত্তরসূরী সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। পারাটাও কঠিন। কারণ প্রত্যেক শিল্পীই তার কণ্ঠে, প্রশিক্ষণে ও ব্যক্তিত্বে আলাদা মানুষ। তবে লালনের গানের ব্যাপারে ফরিদা পারভীন একটা ভালো কাজের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তা হচ্ছে লালনের গানগুলোর স্বরলিপি তৈরী করা। এ কাজটা ঠিক মতো হতে পারলে লালনের গানের উত্তরসূরীদের জন্যে খুবই উপকার হতে পারত। আমি শুনেছি কাজটা উনি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি।

প্রতিবাদের মুখ, মানবতার মুখ

জুবিন গর্গ

শুভাশিস মজুমদার

সময়টা ২০১৯ সাল, সারা দেশ জুড়ে চলছে সিএএ বিরোধী আন্দোলন। দিকে দিকে চলছে লাগাতার প্রতিবাদ। হাজার হাজার মানুষ প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে পথে নেমেছে। আসামেও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। জোরদার প্রতিবাদের ঢেউ সেখানে আছড়ে পড়েছিল। বিশেষত গৌহাটিতে দিন রাত এক করে প্রতিবাদ আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলনের প্রধান কান্ডারী ছিলেন গায়ক অভিনেতা জুবিন গর্গ। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, এরা রাজ্যের মানুষকে মারতে চায়। কোনো ভাবেই সিএএ কার্যকর হতে দেওয়া যায় না। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি সংসদে সিএএ আইন পাশ করিয়ে নিলেও আসামের মানুষের কাছে জুবিন গর্গের আবেদন ছিল এর বিরোধীতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

১৯ সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মাত্র ৫২ বছর বয়সে অকালে প্রয়াত হলেন জুবিন গর্গ। যখন বিশ্ববাসী জিজ্ঞাসা করে, আসামবাসীর কাছে জুবিন গর্গ কেন এত বিশেষ, তখন তাঁর প্রয়াণের পরে সারা আসামের লক্ষ লক্ষ মনুষের ঐক্যবদ্ধ অশ্রু ছাড়া আর কিছু দেখার দরকার নেই। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে টানা পাঁচ দিন ধরে সারা রাজ্য একসাথে শোক প্রকাশ করেছে। সারা দেশ বিস্ময়ের সঙ্গে যা প্রত্যক্ষ করেছে।

উর্দিধারী পুলিশ অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সব স্তরের, সব ক্ষেত্রের, সব বয়সের মানুষ সমবেত ভাবে শোক প্রকাশ করেছেন। সকলেই যেন অসহায় হয়ে পড়েছেন! সকলেই কাঁদছেন। জুবিনদা-কে হারানোর শোকে আসামের যুব সমাজ বিহ্বল!

দৃশ্যগুলো ছিল যেকোনো সাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলির চেয়েও ব্যতিক্রম। বিমানবন্দরে তাঁকে (পার্থিব শরীর) স্বাগত জানাতে ভিড়, রাস্তায় ভিড়, প্রচণ্ড রোদ আর বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে ভরে গেল সরুসাজাই স্টেডিয়াম - সবাই সেই মানুষটিকে শেষ এক ঝলক দেখার জন্য আকুল। যাঁর সুর তাঁদের আত্মাকে ছুঁয়ে গেছে।

বিশ্ব হয়তো তাঁকে 'ইয়া আলি' গায়ক হিসেবেই চিনত, কিন্তু ১৯ সেপ্টেম্বর, সেই পরিস্থিতি চিরতরে বদলে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষের শোক প্রকাশের সময় ইন্টারনেট বিস্ময়ের সাথে তা দেখল। আসামের বাইরের অনেকেই স্বীকার করেছেন, 'আমরা জানতাম না যে তিনি এত বিখ্যাত!'

কিন্তু আসামবাসীর কাছে তিনি কখনোই কেবল 'বিখ্যাত' ছিলেন না। তাঁর বলিউড হিট গানের জন্য নয়; এমনকি তাঁর অসংখ্য অসমীয়া চার্টবাস্টার গানের জন্যও নয়। আসামের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন এক বিরল আত্মা, সম্ভবত সহস্রাধে একবার জন্মগ্রহণকারী, যিনি তাঁদের জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন এবং রূপান্তরিত করেছিলেন, নীরবে চলে যাওয়ার আগে। যখন তিনি গান গাইতেন, তখন জনতা উত্তাল হয়ে উঠত। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তরুণরা অনুপ্রাণিত হত। যখন তিনি প্রতিবাদ করতেন, তখন তিনি তাঁদের আশা দিয়েছিলেন যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের কেউ নেই। তিনি ছিলেন জুবিন গর্গ।

তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, 'আমি যখন মারা যাব, কেবল মায়াবিনী বাজাও।' যা ছিল তাঁরই গাওয়া তাঁর প্রিয় গান। আর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন সেই গানটি কেবল সঙ্গীতের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠল। এটি এমনই একটি সঙ্গীত হয়ে উঠল, যা আসামবাসীর হৃদয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার একটি আন্দোলন। তাঁর গানগুলি কেবল বিনোদন ছিল না। এগুলি ছিল নিদ্রাহীনদের জন্য ঘুমপাড়ানি গান, ভগ্নহৃদয়ের জন্য প্রেমপত্র এবং প্রতিবাদীদের জন্য যুদ্ধের হুংকার। তাঁর গান মানুষকে দুঃখ, আনন্দ এমনকি বিপ্লবের মধ্য দিয়েও নিয়ে গিয়েছে। তাঁর কৌতুকপূর্ণ উক্তি 'ঘেন্টা মোই কাকু খাতির নোকোরু' (ঘণ্টা, আমি কাউকে খাতির করি না) থেকে শুরু করে তাঁর জীবন দর্শন, 'মুর কুনু জাতি নাই, মুর কুনু ধরমো নাই, মোই ওকল মানুহ' (আমার কোন জাতি নেই, আমার কোন ধর্ম নেই, আমি কেবল মানুষ), তাঁর এই কথাগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রতিধ্বনিত হবে।

তিনি ছিলেন জনগণের কণ্ঠস্বর, এতটাই শক্তিশালী যে সমগ্র রাজ্যের জীবন টানা চার দিন ধরে থেমে ছিল, তাঁকে কেবল একবার শেষ দেখার জন্য অন্তহীন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে, আসাম সঙ্গীতে ডুবে গেছে। প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি গলি, প্রতিটি বাড়িতে তাঁর গান বাজছে। এর চেয়ে উপযুক্ত বিদায় আর হতে পারে না- সেই মানুষটির জন্য সঙ্গীত যিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে আসামবাসীদের সবকিছু দিয়েছেন। কিন্তু জুবিন ছিলেন একজন গায়ক বা অভিনেতার চেয়েও বেশি কিছু। তিনি প্রকৃতির জন্য, প্রাণীদের জন্য, যুবসমাজের জন্য, নিপীড়িতদের জন্য, আসামের জন্য একজন যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজের কণ্ঠস্বর। আসাম ট্রিবিউন সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, 'আর কখনও জুবিন গর্গ হতে পারে না। আগামীকাল নয়। ১০০ বছরে নয়। ১০০০ বছরে নয়। কখনও নয়।'

'' নাগরিক '' -এর পরবর্তী বিশেষ সংখ্যা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে ১৭ অক্টোবর প্রকাশিত হবে।